# রুমানা রুমি

## রূপসি আগুন

উর্দু থেকে অনুবাদ : মবিনুল হক

রাতের অন্ধকার তখনও চারদিক ব্যাপ্ত করে রেখেছিল। আজ আমার খেতে সেচের জল ধরবার দিন বলে প্রচণ্ড ঠান্ডা সত্ত্বেও গররাজি মনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে চলে এসেছি। এমনিতেই শীতের রাতে গরম লেপ আর যুবতী স্ত্রীকে ছেড়ে আসা বড়োই কঠিন কাজ। আমি এখনও শরীরের প্রতি রোমকণিকায় আমার স্ত্রীর উষ্ণতা অনুভব করে এই ঠান্ডার মোকাবিলা খুশি মনেই করছিলাম। খেতে জল ধরার পর আমি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করলাম আর খেতের একপ্রান্তে এক ছোট্ট আলপথের উপর বসে পড়লাম। দু-এক টান কষে নেওয়ার পর ঠান্ডায় কাঁপতে থাকা হাত-পায়ে কিছুটা সাড়া পাওয়া গেল।

আমার মনের মধ্যে আজ রাতের ফেলে-আসা সুন্দর মুহূর্তগুলি কোনো সিনেমায় দেখা দৃশ্যের মতো চোখের সামনে ভাসতে লাগল আর আমার হৃদয় মন্ত্রবৎ মুগ্ধতায় দুলতে লাগল ... নুরান-এর আত্ম-সমর্পণী বৈভঙ্গের নেশা যেকোনো প্রথম সারির মহার্ঘ নেশার চেয়ে কম নয়। আর যখন থেকে নুরান আমার জীবনে এসেছে, আমার আর কোনো কাল্পনিক নেশার প্রয়োজন হয়নি। নুরান-এর নেশায় ডুবে আমি না-জানি আরও কতকিছু ভেবে যেতাম, কিন্তু উষার আলোয় আকাশে অন্ধকারের রহস্যময়তা কমে আসতে থাকায় হঠাৎ আমার দৃষ্টি সেই ছায়ামূর্তির উপর পড়ল— যে সূর্যকিরণের দিকে পিঠ রেখে এগিয়ে আসছিল। দূরত্ব কিছুটা কমে এলে ছায়ামূর্তিটি কোনো নারীর অবয়বে স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে ভাবছিলাম— কে এই নারী, যে এই হাড়হিম ঠান্ডাকেও পরোয়া না করে না-জানি কোথা থেকে সে এই গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে! যেহেতু সূর্যালোকের দিকে পিঠ করে আসছিল, তাই সে যে খালি হাতে আসছিল তা বোঝা যাচ্ছিল। আর সে কারণেই আমি তার মুখ তখনও পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম না। কৌতূহল আর উদ্বেগ আমাকে চঞ্চল করে তুলল। আমি সেখান থেকে উঠে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। ওকে দেখে চমকে উঠলাম। সে ছিল ল্যাংড়া ফজলুর বিবি মিরান!

তার হাঁটাচলায় এমন এক নমনীয় ভঙ্গি ছিল, যা ওর যৌবনভরা আপাদমস্তক শরীরকে প্রলয়ংকরী করে গড়ে তুলেছিল ...। চোখের গোলাপি রেখা নিশ্চিতভাবেই তার রাতজাগার কাহিনি বয়ান করছিল। সম্ভবত আজই প্রথমবার কেউ তাকে এভাবে গ্রামে ফিরতে দেখছে। কিন্তু তার চোখমুখে বদনাম হওয়ার ভয় বা তার বিন্দুমাত্র ছায়াও ছিল না। ... সে চোখ তুলে সরাসরি আমার দিকে তাকিয়ে দেখল। আমি নীরবতা ভেঙে বললাম, 'কী ভাবি, কোথা থেকে আসছ? তাও আবার এত সকাল সকাল? সব মঙ্গল তো?'

সে আমাকে আর আমার কথাবার্তাকে পাত্তাই দিল না। দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে লাগল।

'আরে ও ভাবি, একটু দাঁড়িয়ে যাও না, কিছু তো বলবে? নাকি আমি এ কথাই ধরে নেব যে, আজ অবধি গ্রামের লোকজন তোমার সম্পর্কে যা কিছু বলে সব ঠিক বলে?'

সে ঘুরে দাঁড়াল। রাগান্বিত স্বরে বলল, 'কী বলে গ্রামের লোকেরা? আর তুই কি এখানকার সরপঞ্চ প্রধান নাকি যে এসব প্রশ্ন করছিস?'

কিন্তু আমি তো আজ ওর সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছি। তাই কোনোরকম ভূমিকা না করেই শুধালাম, 'আজ তাহলে তুই এ কথাটা খুলে বল যে তোর প্রাণের রাজা, হৃদয়ের মালিকটি কে? মনে হয় এই-ই হল সেই রাজা, যার জন্য তুই রোজ সকালবেলা ফজলুর মার খাওয়ার জন্য তৈরি থাকিস! তোর ভয় হয় না?'

আমি ওর যাওয়ার পথের মাঝ বরাবর সটান দাঁড়িয়ে পড়লাম। সে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার রাস্তা খুঁজছিল। আমার প্রশ্নগুলো যেন হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। পাত্তা দেয়নি একেবারেই। ফজলু যে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু— একথা শুধু সে নয়, গ্রামের সকলেই জানত। আর সেই বন্ধুত্বের সূত্রেই আমার এসব প্রশ্ন করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

গ্রামের লোকজন মিরান-এর ব্যাপারে কোনো ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করত না। মেয়েরা তো এমনিতেই ওর সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করত না। অতীতের দিনগুলিতে ওদের ঘর থেকে সকাল সকাল যেসব ঝগড়াঝাঁটির শোরগোল শোনা যেত, এখন আর তা নতুন কিছু ছিল না। কিন্তু সে-সব কথা ছিল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বানানো কথা। আর সেজন্যই আজ অবধি কেউ মিরানকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করার সাহস দেখাতে পারেনি। এমন এক সময় ছিল যখন আমার বিবি নুরান-এর সঙ্গে ওর অত্যন্ত গভীর সখিত্ব বজায় ছিল। কিন্তু বিয়ের পর দুজনেই একে অপরের থেকে দুরে সরে যায়। আমি বেশ কয়েকবার নুরানের কাছ থেকে মিরানের বিষয়ে জানার চেষ্টা করেছি, কিন্তু প্রতিবারেই সে অত্যন্ত কৌশলে কথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। এমনিতে ব্যক্তিগতভাবে কারোরই ওর প্রতি কোনো অভিযোগ ছিল না। সে সমস্ত কাজকর্ম— যা সাধারণত গ্রামের প্রত্যেক মেয়েই নিজস্ব দায়-দায়িত্ব বলে মনে করে— সেইসব কাজকর্ম সে তেমনভাবেই করত যেভাবে অন্যেরা করে থাকে। কিন্তু শেষতক ওর আর ফলজুর মধ্যে যে কী সমস্যা ছিল, সে বিষয়ে কেউ কিছু জানত না।

মিরানের সঙ্গে ফজলুর বিয়েটাও ছিল এক মস্ত প্রশ্নচিহ্ন! কোথায় যৌবনরসে ভরপুর মিরান আর কোথায় রসকষহীন ফজলু! না আছে স্বাস্থ্য, না রূপযৌবন! তার উপর সোনায় সোহাগা হয়েছে তার ল্যাংড়া অকেজো পা। তবে হ্যাঁ, টাকা-পয়সার কথা ধরলে ফজলুর বাপের জমিজায়গা, বিষয়-সম্পত্তির পরিমাণ সারা গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বেশিই ছিল। আর বাড়িতে লোকজনও ছিল গোনাগুনতি। ব্যস্, ওই ফজলু আর তার বাপ। ওর মা তো ফজলুর জন্মের পরেই ওপারে চলে গেছে। এছাড়া ওর সামনে পিছনে আর কেউ ছিল না। গ্রামের যেকোনো গরিব কৃষক ফজলুকে মেয়ে দিতে রাজি ছিল। কিন্তু প্রস্তাব উঠে এল মিরানের নামে! আর তাকে একঝলক দেখার জন্য ফজলু মিরানের দরজার সামনে এক পা খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকত। সে অবশ্য জন্ম-খোঁড়া ছিল না। তাই সে আজও তার এই খুঁত মন থেকে

মেনে নিতে পারেনি। ওর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব মিরান প্রথমে খারিজ করে দিয়েছিল। কিন্তু ফজলু ওর বাড়ির দারিদ্র্যকে তাদের চাহিদামতো মূল্যে খরিদ করে নিয়েছিল। মিরানের বাড়ির লোকদের অসহায়তা গ্রামের লোকেরা যেমন বুঝত, তেমনই মিরানের জ্বলন্ত আগুনের মতো শরীরী বিভঙ্গের রহস্যও তাদের কাছে এক হৃদয়গ্রাহী আলোচ্য বিষয় ছিল। আজ আমি সেই রহস্য জানব বলে মন স্থির করেছিলাম। সে যখন কোনো রাস্তা পেল না, তখন সে ওই রাস্তার উপরই বসে পড়ল। তারপর এক গভীর নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আমার সম্পর্কে তোর কী অভিযোগ আছে যে এমনভাবে আমার পেছনে লেগেছিস? আমার মর্জির মালিক তো আমি। আমার যেখানে খুশি আমি যাব, যার সাথে খুশি দেখা করব। যেখানে ফজলুই আমাকে আটকাতে পারেনি সেখানে তুই কে?'

এ প্রশ্নের জবাব আমার কাছে ছিল। কিন্তু ওর রহস্য উন্মোচনের উদ্দেশ্য আমার মূল লক্ষ্য ছিল। আমি তীর্যক দৃষ্টিতে তার মুখের ভাব পড়ার চেষ্টা করতে করতে বললাম, 'কথা তো তোর ঠিকই ভাবি, কিন্তু ... তুই আমাদের গ্রামের আর তার উপর আমার দোস্তের— এই দুই পক্ষেরই ইজ্জত। আর ঘরের ইজ্জত রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে বেরিয়ে ভোরের আলোয় ফিরে এলে প্রশ্ন তো উঠবেই, তাই না?' সে সশব্দে হেসে উঠল। 'গ্রামের ইজ্জত ...! দোস্তের ইজ্জত ...! বড়ো এসেছে ...! যে লোকেরা নিজের ইজ্জতের উপরই কুদৃষ্টি লাগিয়ে বসে থাকে, তাদের মুখে এসব প্রশ্ন শোভা পায় না।'

ওর কথা একেবারে সঠিক ছিল। এখনও গ্রামের লোকেরা ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে থাকে। এখনও সে যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়, লোকজনের দৃষ্টি সেদিকে স্থির হয়ে সেঁটে থাকে। ওর হেঁটে যাওয়ার সৌন্দর্য লোকজনদের দীর্ঘশ্বাস ফেলতে বাধ্য করে। লোকজনেরা উপরে-উপরে ফজলুর ভাগ্যের কথা ভেবে ঈর্ষান্বিত হয় আর অন্তরে-অন্তরে হিংসায় জ্বলেপুড়ে তাকে অভিশাপ দেয়। কেননা প্রত্যেকেই, এমনকী বিয়ে-থা করা লোকজনেরাও ফজলুর বিবিকে নিজের মেহবুবা বানানোর চক্করে উঠেপড়ে লেগেছিল। কিন্তু কেউই সফল হতে পারেনি। কেননা মিরান গ্রামের কারো সঙ্গেই নিজে থেকে কথা বলত না।

যেহেতু ফজলুর সঙ্গে মিরানের বিয়ের দিন থেকেই বনিবনা হয়নি, সেহেতু গ্রামের লোকজনেরা মিরানের বিষয়ে একথা ভেবে সন্দেহ করত যে ফজলু ছাড়াও অন্য কোনো জোয়ান মরদ মিরানের যৌবনসুধা উপভোগ করে! তা না হলে ওর এই রসপূর্ণ যৌবন আর তার উপরে ওই মস্তানি চালচলন শুধুমাত্র ফজলুর সঙ্গে মিলনের ফলে হতে পারে না। সকলেই একথায় চিন্তান্বিত ছিল যে ...। কিন্তু সেই মানুষটি কে? সেটাই ছিল মস্ত বড়ো প্রশ্ন!

আমি জানতাম যে সে এত সহজে হার স্বীকার করবে না। সূর্যের প্রথম কিরণ মাটি ছুঁয়েছে তখন। সে সূর্যের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে এক উষ্ণ আড়মোড়া ভাঙল। ওর চোখে রাতের আনন্দময় নেশার ঘোরলাগা রেশ লেগে ছিল। তার ওই উষ্ণ আড়মোড়া ভাঙা আর শরীর থেকে ভেসে আসা যৌবনের সুগন্ধ আমার মাথা থেকে নুরানের অস্তিত্ব মুছে ফেলল। আমি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার ওই রূপকে চোখের মধ্য দিয়ে হৃদয়ের গভীরে পাঠিয়ে দিচ্ছিলাম।

এমন রূপবতী আগুন আর এমন যৌবনদশা আমি আর কখনো দেখিনি। আজ প্রথমবার ফজলুর প্রতি আমিও ঈর্ষা অনুভব করলাম। আমাকে আত্মমগ্ন দেখে সে উঠল। সে যেমনই উঠে দাঁড়াল, এক মুহূর্তের জন্য আমার চোখের সামনে অন্ধকার ছেয়ে গেল। আমিও উঠে পড়লাম আর ওর হাত ধরলাম। ওফ, ওই ঠান্ডাতেও ওর শরীর যেন আগুন বর্ষণ করছিল। আমি ওর সামনে, ওর একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওর শরীর থেকে উঠে আসা গরম নিশ্বাস আমার হৃদয় আর বোধবুদ্ধিকে অসাড় করে দিচ্ছিল। আমি খুব শক্ত করে তার হাত ধরলাম। কিন্তু সে কোনো বাধা দিল না। বরং সে যেন আমার এই মত্ততার স্বাদ গ্রহণ করছিল। আমি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গেলাম আর মৃদুকণ্ঠে বললাম, 'আজ প্রথমবার আমি তোর মধ্যে সেই কথাটি দেখলাম যে-কথায় সারা গ্রাম পাগল হয়ে রয়েছে। আজকের আগে আমি তোকে কেবল আমার দোস্তের 'আমানত' (গচ্ছিত, দায়িত্বপ্রাপ্ত) ভাবতাম, কিন্তু তুই তো বরফে ঢেকে রাখা সেই আগুন, যাকে শুধুমাত্র আমিই দেখতে পাইনি। ব্যস্, শুধু একটা কথার জবাব দিয়ে দে, কে সেই লোক— যার জন্য তুই কোনো ভয়-ডরকে পরোয়া করিস না?'

হঠাৎ তার চোখ থেকে মিলনাকাঙ্ক্ষার রং উধাও হয়ে গেল। আর সেই স্থান অস্থির নিয়তি দখল করে নিল। রঙিন মদালস চোখ তার অশ্রুভারানত হয়ে ছলছল করতে লাগল। সে বলল, 'আমি জানি তুমি ফজলুর দোস্ত। কিন্তু গ্রামবাসীদের মতো তুমি কখনোই আমাকে চোখ তুলে দেখনি। কিন্তু আজ তোমার চোখমুখ, ঠোঁট আর কণ্ঠস্বর ফজলুর দোস্তের মতো নয়। এতে কোনো অন্যস্বর, অন্যরং রয়েছে। এই যে তোমার চোখের ভিতর যে নেশা রয়েছে, সেটা আসলে আমারই মুখের প্রতিচ্ছায়া— যা তোমার ভিতরেও আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।'

আমি লজ্জিত হলাম। সে সত্যি কথাই বলেছে। তবে প্রশ্নগুলি তখনও হয়তো চোখের ভিতর থমকে থেকে প্রশ্ন করে যাচ্ছিল। সে এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'তুমি কি জানো না যে প্রেমিক হারানোর দুঃখ কেমন হয়ে থাকে? তুমি আর নুরান— তোমাদের দুজনেরই সৌভাগ্য যে তোমরা একে অপরকে কামনা করেছ আর একে অপরের হতে পেরেছ। তাই তুমি সেই ব্যথা, সেই কষ্টকে অনুভবই করতে পারবে না। প্রেম যখন বিচ্ছিন্ন আর অভিমানী হয়, তখন নিজের হৃদয়কে প্রবোধ দেওয়া সহজ হয় না। আমিও অনেক চেষ্টা করেছি সেই অভিমানী হৃদয়কে প্রবোধ দেওয়ার। কিন্তু শেষপর্যন্ত হৃদয়ই জয়ী হয়েছে। আর যাকে তুমি ভয়-ডর বলছ, সেটাই তো প্রেম। যখন প্রেমের চূড়ান্ত সীমা শেষ হয়ে যায়, তখন এই ভয়-ডর কিছুই থাকে না। তখন কেবল একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে। আর সেটা হল ওই হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা। সে চারদিক থেকে ওর দিকে বৃত্ত বানাতে বানাতে ঘুরতে থাকে। তাতে কারো হুঁশও থাকে না, পরোয়াও থাকে না। চারদিকে কেবল সে আর সে। আর থাকে নিজের ঘূর্ণ্যমান অস্তিত্ব।'

আমি আপন জায়গায় বোধশূন্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ওর আত্মোন্মাদ কথাবার্তা আমার বোধবুদ্ধির বাইরে ছিল। সে যৌবনগর্বী মদমত্ত চালে হাঁটতে হাঁটতে গুন গুন করছিল আর দূর থেকে আরও দূরতম দূরত্বে এগিয়ে যাচ্ছিল।

[লেখক পরিচিতি : রুমানা রুমি সাম্প্রতিক পাকিস্তানি উর্দু গল্পের ধারায় অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন প্রতিভাধর এক লেখিকা। তিনি করাচি শহরে থাকেন।]